Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 408 – 414
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

নারীচেতনার আলোকে রাধিকাসুন্দরী : একটি বিশ্লেষণ

ড. মথুর গুপ্ত
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কবি নজরুল কলেজ, বীরভূম
ইমেইল : mathurg02@gmail.com

Keyword
আখ্যান, নারীচেতনাবাদ, রাধিকাসুন্দরী, উপন্যাস।

Abstract
বাংলা আখ্যানকে নারীচেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করতে গেলে অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' নারীচেতনার আখ্যানে একটি করে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। আখ্যানের বিচ্ছুরণ বহুমাত্রিক। তার মধ্যে একটি রশ্মি হিসাবে বর্তমান জীবনের অন্যতম লিঙ্গ সমস্যার কথা উল্লেখ করতে পারা যায়। বাংলা আখ্যান নয়, সমগ্র সাহিত্য সমাজ পরিসরে নারী-পুরুষ সমস্যা আজ অন্যান্য অনেক সমস্যার থেকেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

> "পিতৃতন্ত্রের অনুশাসনে শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা নারীর স্বকীয় সত্ত্বা-স্বরূপ-ভাষা-ইতিহাস নির্মাণের আপ্রাণ প্রয়াস।" (দাশগুপ্ত, প্রদীপণ, 'মানবী চেতনার বিশ্বায়ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' অমৃতলোক, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৩০)

অতি আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের বিনির্মাণ ঘটে গেছে নারীবাদী বিশ্লেষণের হাত ধরে। রাধিকাসুন্দরী সমাজের সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিসর থেকে উঠে এলেও, জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার লড়াই ভিন্ন উপায়ে হলেও, বাঁচার তাগিদ অসম্ভব। পিতৃতন্ত্রের প্রবল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গিয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার এক ভীষণ লড়াই এর প্রতিচ্ছবি তার জীবন।
আখানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—

> "এক বা একাধিক কথকের দ্বারা এক বা একাধিক আখ্যান গ্রাহকের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক বাস্তব বা কাল্পনিক ঘটনার পুনঃকথন হল আখ্যান।" (দত্ত, সম্রাট, 'বিশশতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৫)

তবে বলাবাহুল্য, নারীচেতনাবাদী আখ্যানকে হুবহু এই ফ্রেমে বিশ্লেষণ করা বেশ কঠিন। তবে, অসম্ভব নয়। এই ধরনের সংজ্ঞায় দেখা গেছে অতীত ক্রিয়ার প্রাধান্য। সুতরাং নারীবাদী আখ্যানের প্রেক্ষিতে এই সংজ্ঞার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে যে, লৈঙ্গিক অসাম্য সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে এর সৃষ্টি মূলত এর সূত্রপাত আর্য পরবর্তী যুগে। কারণ প্রাক্ আর্যযুগে আমাদের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিত। আর্যরা আসার পর সমস্ত ব্যবস্থার এক ভয়ানক পরিবর্তন আসে, শুরু হয় পিতৃতন্ত্রের আগ্রাসন। এই আগ্রাসন এই উপনিবেশিকতা থেকে নারী আজও মুক্ত হতে পারেনি। আখ্যানে এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে। নারীচেতনাবাদ তাই আর একটিমাত্র সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি 'Interdisiplinary Approach' -র অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

নারীচেতনাবাদী আখ্যানের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আখ্যানত্ব এবং আখ্যান মাধ্যম। আখ্যানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংগঠনের দ্বিস্তরিকতা। আখ্যানে মূলত সময়গত সংগঠন দু'ধরনের হয়, (ক) Story time (খ) discourse time যেসময় কাহিনির মূল ঘটনাগুলি ঘটে আর একটা যে সময় আখ্যান পাঠক আখ্যান পাঠ করেন। সুতরাং নারীবাদী আখ্যান প্রেক্ষিত বহু প্রাচীন। বিশ শতকে সাহিত্য সমালোচনায় একটি অন্যতম ধারা হল আখ্যানতত্ত্ব। যদিও সুপ্রাচীনকালে প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ আখ্যানের বিভিন্ন আলোচনা করেছিলেন কিন্তু সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা হিসাবে আখ্যানের আত্মপ্রকাশ বিশ শতকে এসেই।

Discussion

অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসটিও বাংলা আখ্যানে নারীবাদী ধারাকে বহন করে চলেছে। যদিও আখ্যানতত্ত্বে এটি কোনো নতুন ধরনের ধারা নয়, এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস হল 'অরক্ষণীয়া', 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে' ইত্যাদি অজস্র আছে। তবে অমলেন্দুবাবুর উপন্যাসের আখ্যানভাগে আরো কঠিন সমাজ বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। গ্রাম থেকে শহরে আসা একটি গরিব মেয়ে জীবনযুদ্ধে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল তার বিচিত্র রূপই রাধিকাসুন্দরী উপন্যাসে বাস্তবায়িত হয়েছে। আখ্যানের এই ভিন্ন মাত্রাকে অভিনবত্ব দান করেছেন ঔপন্যাসিক।

আখ্যানতত্ত্বের শুষ্ক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে নারীচেতনাবাদী প্রেক্ষিতে আখ্যানতত্ত্বের বিশ্লেষণ যেমন সরস তেমনি সমাজ উপযোগী। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাস তিনপর্বে বিন্যস্ত। সমাজে নারীর কঠিন অবস্থা ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। যেখানে নিম্ন প্রান্তিকায়িত রাধিকাসুন্দরী ও উচ্চবিত্ত, কিরণশশী সকলেই পিতৃতন্ত্রের আগ্রাসনের শিকার কিন্তু উভয়েই সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে একেবারে ভিন্ন মাত্রার । অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নারী মাত্রই পুরুষতন্ত্রের শিকার। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে নারীর এ-এক জীবনব্যাপী সংগ্রাম। পিতৃতান্ত্রিক পরিসরে থেকেও এদের বিরোধিতা করা যেন জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়ায়ের সামিল। কিন্তু এখানেই মানুষের সঙ্গে তফাত প্রাণীর। কুমীর আর মানুষ কোনো ভাবেই তুলনীয় নয়, তবে পুরুষের আগ্রাসনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজতম উপায় হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে সম্পর্কের মধ্যে থেকে সম্পর্কে উত্তরণের কথা। অর্থাৎ প্রত্যাশা জীবনকে বিষময় করে তোলে। সম্পর্কের কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করা উচিত নয়।

রাধিকাসুন্দরী আর্থিক স্বাধীনতার কারণে হুগলী জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরে এসেছে দুটো টাকার মুখ দেখার আশায়। আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে। একটু ভালো থাকার আশায়। রাধিকার দুঃসহ জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আপ্রাণ প্রয়াসই রাধিকাসুন্দরী।

> "কবিতা ব্যক্তিক ও অনুভূতিপ্রবণ হলেও কথাসাহিত্য অথবা আখ্যান বস্তুবিশ্বকে ধারণ করেই রচিত হয়। ফলে শিল্পে রূপান্তরের পর তা যতই ভিন্ন বলে মনে হোক, বাস্তবকে এড়িয়ে অথবা অগ্রাহ্য করে তা রচনা সম্ভব নয়।"[১]

তাই এই সময়ের আখ্যানে বারবার উঠে এসেছে বিপন্ন মানবী বিশ্বের কথা। বর্তমানে এই বিপন্ন মানবী বিশ্বের অস্তিত্বের খোঁজ করতে গিয়ে 'রাধিকাসুন্দরী' এক অন্যতম চরিত্র। নারীর এই অস্তিত্ব সংকট ও সেখান থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজতে গিয়ে যে পরিসরে ঘোরাফেরা করা হয় তাতে অনেকটাই নারীচেতনাবাদের সৌরভ চলে আসে। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' নারীর বিপন্ন অস্তিত্বকে নিয়ে এক অসাধারণ উপন্যাস। শুধুমাত্র সাহিত্য নয়, বাস্তব কথা এই উপন্যাসে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> "যত সময়-পরিসর ঘটনা বৃত্তান্ত সম্পর্কিত অনুপুঙ্খগুলি আহরণ করি— সূত্রধর এবং/অথবা গ্রহীতা হিসাবে—সংযোগের প্রকরণ গুলি অনিবার্যভাবে আমাদের সংবেদনায় সম্পৃক্ত হয়ে যায়।"[২]

'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসটি পড়তে গেলে যে উপন্যাসের কথা সবথেকে বেশি মনে আসে তা হল 'অরক্ষণীয়া', 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে' ব্যাপক একটা সময়ে পরিবর্তন ঘটে গেলেও নারীর অবস্থা কিন্তু তেমন কোনো পরিবর্তিত হয়নি। আখ্যান একই থেকে গেছে। কিন্তু আধারের পরিবর্তন না হলেও জিনিসের কিন্তু বহু পার্থক্য থেকে গেছে। নারীর সমস্যার পরিবর্তন না ঘটলেও সমস্যা পটের পরিবর্তন ঘটে গেছে শরৎচন্দ্র থেকে অমলেন্দু চক্রবর্তীর রচনা এবং সাহিত্যপটে। 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির নারীর পরিচয় থাকলেও সকলের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কিরণশশী, সুমতিবালা, রাধিকা, পরি সকলেই নারীর প্রায় একই অবস্থা বহন করে চলেছে। জীবনতত্ত্ব ও আখ্যানতত্ত্বের এক মিলিত প্রয়াস দেখা গিয়েছিল 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসে। বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্য মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। 'রাধিকাসুন্দরী উপন্যাসে রাধিকা আর উপন্যাসের একটি চরিত্র নেই। সে বাস্তবের এক জীবন যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিধাননগরে কিরণশশী ও নিশীথরঞ্জনের আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটে দাসীবৃত্তি করতে আসে রাধা, সুদুর বেলমুড়ি গ্রাম থেকে। নিজের একটা অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা আর্থিক স্বচ্ছল হওয়ার তাগিদে রাধা চলে আসে নতুন কলকাতার এক আজব দুনিয়ায়, এমনকিছু বেশি বয়সে রাধা দাসীবৃত্তি করতে আসেনি। ছোটো ছেলেমেয়েদের বয়সে যখন তার খেলাধুলো করার সময় তখনই চলে আসে সে দাসীবৃত্তি করতে। কিন্তু এই সব কিছুর পরও রাধার জীবন কাটে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে। জীবনে সে কখনো শান্তি পায় না। সারাজীবন তাকে মাশুল চুকিয়ে আসতে হয় মেয়ে হয়ে জন্মানোর। সারা জীবনে খুব কম মেয়েরাই নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সবকিছুকে গুরুত্ব দিয়ে বাঁচতে পারে। বেশিরভাগ নারীর জীবনই কারাগারে রুদ্ধ কারুর সোনার খাঁচা তো কারুর টিনের তারের খাঁচা, খাঁচা বিভিন্ন উপাদানে তৈরি হলেও খাঁচা কিন্তু খাঁচাই থেকে যায়। খাঁচা থেকে মেয়েরা ততটাই বেরোতে পারে যতটা একটা পুরুষ চায় কোথায়ও তাদের স্বাধীন গতিবিধি নেই। রাধার জীবনের এই চরম সত্যের কথা তুলে ধরেছেন অমলেন্দু চক্রবর্তী তার নির্মম লেখনীতে।

হত দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে রাধা আসে কাজের মেয়ে হয়ে। কিন্তু মেট্রোপলিটন সিটিতে এসে বেলমুড়িগ্রামের রাধা বেশ অবাক-ই হয়। কিন্তু দয়ালু কিরণময়ী তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসে। সবকিছুই দেয়। প্রথম প্রথম রাধা এসে ম্যাক্সি পরত কিন্তু বেশ কিছুদিন পর থেকেই শুরু হয় শাড়ি পরা। কিরণময়ী রাধাকে বলেন –

> "বড় হয়ে যাচ্ছিস তাই। আমার কাছে আছিস সে একরম। কিন্তু তোদের গ্রামে তো আসল মা আছে একজন। আত্মীয় কুটুমরা সবাই রয়েছে। বেশি বাড়ভাল নয়। ওরা বলবে কী আমাকে?"[৩]

এখান থেকেই শুরু হয় সামাজিক নির্মাণ। তুমি মেয়ে তারপর আবার গ্রামের মেয়ে। পিতৃতন্ত্রের মধ্যে থেকে নারী তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিকশিত হতে পারেনি। এভাবে কঠিন বাস্তবের শেড ধরা পড়েছে তার উপন্যাসে।

রাধাকে এভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন দুঃখ, কষ্ট, অপমান, লাঞ্ছনাকে স্মৃতিকরে ফিরে আসতে হয় বেলমুড়ি গ্রামের দাঁড়গাছিতে। সেখানে এসে আবার আর এক ধরনের কষ্ট। দীর্ঘদিন ধরে শহরে থাকার সমস্ত সুযোগ সুবিধার এমনকী বেশ কিছু শহুরে কেতায় অভ্যস্থ হয়ে গিয়ে রাধার গ্রামে এসে বেশ অসুবিধে হতে শুরু করে। বিবাহযোগ্য মেয়েকে ফেলে রাখার সাহস গ্রামের বিধবা করবে না, তাই কোনো রকমের মেয়ে বিয়ে দিতে পারলেই সে দায়মুক্ত হতে পারে। পরিবারে কন্যা সন্তান তখনও বাবা মার বোঝা, তারপর আবার বাবা যদি না থাকে সে মেয়ের অবস্থা তো আরও করুণ। কারণ পিতৃতন্ত্রের মধ্যে থেকে কারুরই পিতৃতন্ত্রকে অস্বীকার করতে পারা সম্ভব নয়। কারণ পুরুষই গোটা সমাজ সংসারকে চালিত করছে তাই সামান্য পরিবারের কর্তা হিসাবে পুরুষ না থাকলে সেই পরিবারের মেয়েরা নষ্ট হিসাবে গণ্য হয়। সেই ভয় হয়তো সুমিতাবালার মধ্যে ছিল। তাই তাড়াতাড়ি সে মেয়েকে কোনো একটি পুরুষের হাতে তুলে দিতে চেয়ে ছিলেন, যার সামাজিক ছাড়পত্র ছিল বিবাহ কিন্তু শিক্ষিত, আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল দয়ালু

কিরণময়ী হয়তো তার বড়ো ছেলেকেও সঠিকভাবে শিক্ষিত করতে পারেননি। তাহলে রাধা ধর্ষিত হোত না। বাবন রাধাকে শুধুমাত্র ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি। জোর করে তার হাতে পাঁচটা একশো টাকার নোট গুঁজে দেয়। তার কাছে রাধার শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণার কোনো মূল্যই নেই। নারীর শরীরের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। অথচ কলকাতার সমস্ত সুযোগ সুবিধায় অভ্যস্থ রাধা তার মা সুমতিবালার কথায় বিবাহ করতে রাজী হয় না। কিন্তু কোনো উপায় না পেয়ে সে মস্তান শিবচন্দ্রের সাথে পালায় শিবচন্দ্রের সাথে রাধার নতুন জীবন শুরু হয় কলকাতার বস্তিতে, সেখানে অবশ্য সে মেট্রোপলিটনে থাকার আর বলাবাহুল্য বড় লোক বাড়িতে থাকার সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে রাধার জীবনে নেমে আসে বিড়ম্বনা, লাঞ্ছনার কালো অন্ধকার। রাধার কাছে এ যেন এক নতুন কোলকাতা সম্পূর্ণ অন্যরকম জীবন। এখানে শিবচন্দ্রের সাথে রাধিকার জীবন কলকাতার বস্তিতে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। শিবচন্দ্র রাধাকে ধর্ষণ করে। কিন্তু শুধুমাত্র বিনিময়ের কথা ভেবে রাধা চুপ করে থাকে। কারণ রাধা মনে করেন শিবচন্দ্র ই তার জীবনসঙ্গী, সে এটা করতেই পারে। নারী এখানে শুধুমাত্র যৌন ভোগ্য সামগ্রী হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য এভাবে ভারতে তথা সারা বিশ্বে অজস্র নারীর ওপর স্বামীর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে। সেটা জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করাই হোক বা স্ত্রীর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শারীরিক সম্পর্কে অনিচ্ছা সবকিছুই হতে পারে। মনু বলেছিলেন বিবাহ-ই নারীর একমাত্র গতি অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছায় নারীর জীবন নির্ধারিত হবে। যৌন নির্যাতন নারীর ওপর কখনোই নিপীড়ন বলে গ্রাহ্য করতে নারাজ পুরুষ। কারণ পিতৃতন্ত্রের ধ্বজা অক্ষুণ্ন রাখতে পুরুষের যৌন আগ্রহকে বা অনাগ্রহ কে নারী প্রেক্ষিতে বিচার করলে পিতৃতন্ত্রের অপমান।
তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় –

> "আঙ্গিকের সামঞ্জস্য ব্যাহত হয় দেখাদের নানা ধরনের কূটাভাস, তখন কোনো কোনো কথাকার যেন সময়ের দাবিতে এগিয়ে এসে অভ্যাসের জড়তা ভাঙার আয়োজন করেন। কথাশিল্প পর্ব পর্বান্তরের সূচনা হয়।"[৪]

কথা শিল্পের ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়েই জন্ম নেয় 'আখ্যান'। প্রত্যেকদিন প্রত্যেক মুহূর্ত পাল্টে যাচ্ছে সময়ের বহিঃপ্রকাশ তাই জীবন যাপনের প্রত্যেকটি বিন্দু-ই ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান, রাধিকাসুন্দরীর প্রেক্ষিতে এভাবেই আখ্যান ভাবনায় সংযুক্ত হয়েছে অভিনব মাত্রা। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যেতে পারে যে, যে কোনো আখ্যানের মূল দায়িত্ব হ'ল এক বা একাধিক স্পেস এ পাঠকদের চালিত করা। সময় সম্পর্ককেও একই কথা। সব আখ্যানই অতীতের কিন্তু পাঠকের কাছে তা বর্তমান হয়ে যায়।

রাধিকাসুন্দরীর বর্ণনা কথন বা গল্প ভীষণ বেশি সমসাময়িক, শিবচন্দ্রের সাথে থাকা নতুন জীবনে পরিই রাধিকার ত্রাতা, সহায়িকা, বন্ধু, এই উপন্যাসের মধ্যে কোনো সুখকর পরিণতি নেই। আছে বাস্তবের কঠোর নিষ্ঠুর রূঢ়তা। ঔপন্যাসিক পাঠককে শান্তি সখের পরিণতিতে পৌঁছতে দেননি। শিবচন্দ্রের সাথে কলকাতায় আসার পূর্বে রাধিকার জীবন ছিল একরম আর শিবচন্দ্রের সাথে আসার পর রাধিকার জীবন হয়ে যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাবন, মুনমুন, বুলবুলির প্রতি কিরণময়ী অত্যন্ত দুর্বল থাকলেও রাধাকে যে তিনি একদম সহ্য করতে পারতেন না. তেমন নয়। যদিও সন্তানের সাথে পরিচালিকার কোনো তুলনাই চলে না। তবুও কিরণময়ী রাধিকার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। রাধাকে কিরণময়ীর তিন সন্তান ডাইনির অপযশ দিলেও কিরণময়ীর দ্বারা উদ্ধার হয় রাধা। এক্ষেত্রে বলাবাহুল্য –

> "শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বোঝে না।"[৫]

এটা তো গেল অনেকটা সমাজতন্ত্রের কথা কিন্তু রাধার যেমন অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছিল। নিশীথরঞ্জনের ফেলে আসা অতীতকে কিন্তু ধনী কিরণময়ী ও অস্বীকার করতে পারে না। এখানে একেবারে আর্থিক সহায় সম্বলহীন রাধিকা ও কিরণময়ী কোথাও একই রেখায় মিশে যাচ্ছে। পুরুষতন্ত্র শিক্ষা, অশিক্ষা, ধনী, দরিদ্র, সব ক্ষেত্রেই তার করাল থাবা

বসিয়েছে। ঔপনিবেশিক নারী তা অতিক্রম করতে পারেনি। হাজার অপমান, লাঞ্ছনা সত্ত্বেও নারী তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে এগিয়ে গেলেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তাদের নিজস্ব জগৎই তৈরি হয়নি। এখানে রাধা বা কিরণময়ী কারুর-ই নিজের ভুবন গড়ে ওঠেনি।

আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেকসময় জন্মদাত্রী ও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বাবা মা আমাদের জন্ম দেন ঠিকই। লালন পালন করেন, স্নেহ ভালোবাসা সবটুকু দেন। কিন্তু একটা সময়ের পর তাদের মধ্যেও জেগে ওঠে বিনিময়ের আশা। এটা খুব সহজ মনস্তত্ত্ব সে সন্তানের কাছে অকারণ সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে। যেন খারাপ টা দেখিয়ে পরিবর্তে ভালো কিছু পাওয়ার আশা করেন তারা, এটাই চিরন্তন চিরকাল ব্যাপী চলে আসছে। এটা হয়ত পিতা মাতা খুব সচেতনভাবেই করেন। একটা সময়ের পর মানুষ ভীষণ স্বার্থপর হয়ে পড়ে। রাধিকাসুন্দরীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এর সমর্থনে রাধিকাসুন্দরী বলে—

> "মেয়ে ঘরে ফিরবে বলে মেয়েরই রোজগারে শুধু এইটুকুই করতে পেরেছে ঘাড় মটকানো বুড়ি।"[৬]

রাধার যেন দুঃখ করার জায়গাটিও নেই, আনন্দ প্রকাশের জায়গাটুকু ও নেই। আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে, একটু ভালো থাকার জন্য রাধার আপ্রাণ প্রয়াস, 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু এছাড়া তো তার জীবনে আছে অজস্র ঝড় ঝাপটা টানা পোড়েন, সব কিছুকে অতিক্রম করেই বোধহয় রাধিকার ভালো থাকার প্রয়াস তবুও শেষ রক্ষা হয় না, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকার মতো রাধা নিজের ভাগ্যের প্রতি কখনো চোখের জল ফেলে না। সে আপন ভাগ্য জয় করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়।

কলকাতা পালায়। এদিকে বিধবা মা সুমতিবালাকে শুনতে হয়, সমস্ত গ্রামবাসীর অভিযোগ বলাবাহুল্য এটা যদি পুরুষসন্তান পালাতো তাহলে হয়ত তাকে এতো কথা শুনতে হোত না। পিতৃতন্ত্রের মধ্যেবাস করে পিতৃতন্ত্রের বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। এটাই হয়ত সমগ্র পুরুষ জাতির সচতুর কৌশল। আর ঔপনিবেশিক ভাবনায় প্রক্ষালিত নারী জগতের প্রতিনিধি সুমতিবালা তখন নিজের মেয়েকেও নষ্ট মেয়ে বলতে ছাড়েনি। তার লড়াই হল কলকাতায় যাওয়া এখানেই দেখা যাচ্ছে আখ্যান ভাবনার বিবর্তন, ঐতিহ্যের পরিবর্তে আধুনিকতার ছোঁয়া স্পষ্ট। তবে ঐতিহ্য সহকারে নারী এখানেও নির্যাতিত হচ্ছে কী ভয়ঙ্করভাবে। তার বিবরণ শুনলে শিউরে উঠতে হয়।

শিবচন্দ্রের সাথে কলকাতায় চলে এলেই তার জীবনে শান্তি আসে না। আসলে শিবচন্দ্র জানে মেয়ে মানুষ মানেই ভোগের সামগ্রী তাই সে তার ইচ্ছামতো ভোগ করবে ভেবে কলকাতায় এসেছে। মেয়ে মানুষের ইচ্ছা শুনবে কেন? শিবচন্দ্রের কলকাতায়ে আসাটাও যেন বিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাধার ইচ্ছা কলকাতার গিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা আর শিবচন্দ্রের ইচ্ছা মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করা। সুতরাং শিবচন্দ্র এর মধ্যে কোনো খারাপ দেখে না, লাখ টাকার কারবার ছেড়ে সে এসেছে শুধুমাত্র সুদে আসলে সে রাধাকে ভোগ করে নেবে। সে রাধাকে কলকাতায় এনেছে সুতরাং ভোগ করার ব্যাপারে সে একচুল ছাড়তেও নারাজ। রাধার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্যই শিবচন্দ্র তাকে দেয়নি। শিবচন্দ্রের কাছে মেয়ে মানুষ খুবই সুস্বাদু এবং ভোগ্য। হাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অচল অবস্থার চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে।

> "হাত পুড়ছে পা পুড়ছে চোখ পুড়ছে মাথার চুল পুড়ছে বুক পুড়ছে পাছা পুড়ছে যোনি পুড়ছে জঙ্ঘা পুড়ছে যৌবন পুড়ছে বয়স পুড়ছে সাধ পুড়ছে— তার বেঁচে বরতে থাকার সবটুকুই ঝালমশলায় কুরে কুরে যাচ্ছে কেউ। পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে সে। যেখানে যেখানে সে যতটুকু মেয়ে মানুষ জ্বলে পুড়ে মাংসপিণ্ডে দলা পাকিয়ে মরে যাচ্ছে না, লুট হয়ে যাচ্ছে। এই এলোপাথাড়ি ঝড়ের তাণ্ডবও ফুরোয় এক সময়। লুটপাটের লুটেরাও নিস্তেজ হয়ে আসে।"[৭]

অর্থাৎ নারী শরীরকে দলামোচড়া করতে করতে কর্তা ও একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন-ই শোষিতের হয়ত শারীরিক নিস্তার, কিন্তু মানসিক বিধ্বংসী লীলা চলতেই থাকে শোষিতের মস্তিষ্কে। রাধিকা বিবাহিত নয়, সে শিবচন্দ্রের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কেও খুব একটা ইচ্ছুক নয়, অথচ শুধুমাত্র বিনিময়ের কারণে রাধার হয়ত এই নীরব প্রতিবাদ। কিন্তু

রাধার পাশে সহৃদয় হয়ে নারীচেতনাবাদী প্রতিনিধি রূপে আত্মপ্রকাশ করে পরি। রাধার উপর হওয়া অন্যায় অবিচারের জন্য সে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু অবশেষে উপন্যাসের শেষ সীমায় পৌঁছেও শিবচন্দ্রের এই উক্তিতে স্পষ্ট হয় যে নারী শুধু মাত্র ভোগ্য বস্তু।

রাধিকাসুন্দরী স্বনির্ভর ছিলেন। ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। তার কাজ শুধুমাত্র মহিলা মহলে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি একজন পুরুষের সাথে সমান তালে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলেছিলেন, বস্তুত কর্মে ক্ষমতায়, মননে চিন্তনে নারীর পুরুষের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান ছিল তা এখন অনেকটাই কমে এসেছে বললে ভালো হয়। তবুও বিভিন্ন আলোচনা সমালোচনা নির্মাণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়নি। আর এই লিঙ্গ বিভাজন-ই তৈরি করে নারীর প্রতি সমাজের তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সিমোন দ্য বোভোয়ার 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' গ্রন্থে হয়তো একারণেই নারীকে দ্বিতীয় লিঙ্গের মানুষ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের নারীর প্রতি সহানুভূতিশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হলেও, পুরুষের প্রতিও তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। যদিও রাধিকাসুন্দরী উপন্যাসের শেষে দেখা যায় লিঙ্গনির্মাণের কৃৎকৌশলে প্রতিবাদী নারীর কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। কিন্তু এরপরেও পুরুষের প্রতি তীব্র বিষোদগার দেখা যায় পরির বক্তব্যের মধ্যে। সে পুরুষের জঘন্য শরীর সর্বস্ব পৌরুত্বের প্রতি তীব্র বিষ ঢেলে দিয়েছে। নারীবাদী প্রতিনিধি হিসাবে পরি রাধিকাসুন্দরী উপন্যাসে অন্যতম চরিত্র, ঔপন্যাসিক একজন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নারীর প্রতি এত সহমর্মী দৃষ্টি রেখেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয় সেক্ষেত্রে বলাবাহুল্য সকল পুরুষ মাত্রই নারীবিদ্বেষী নন। তবে নারীচেতনাবাদের সূত্রপাত একজন পুরুষের হাত ধরে। নারীদের সমস্যার সমাধানের জন্য নারীদের এগিয়ে আসতে হবে এক্ষেত্রে রাধিকার সমস্যা নিয়ে সর্বসমক্ষে লড়াই এ নামে পরি এই কাহিনি বা বর্ণনার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় স্থান কাল পাত্র আছে। তাকে বাদ দিলে উপন্যাস হয়তো উপন্যাস-ই হয়ে উঠতো না। তবে এর মধ্যে আখ্যান বিহীনতা কতটা বর্তমান তাও বিচার্য। রাধিকাসুন্দরী উপন্যাসে তিনটি পর্বে ঔপন্যাসিক নারীর ভিন্ন সমস্যাপটের কথা তুলে ধরেছেন। স্থান কাল পাত্রের সাথে নারীর সমস্যা পট পরিবর্তিত হতে থাকে, তার অসাধারণ বিবরণ তুলে ধরেছেন 'রাধিকাসুন্দরী'র উপন্যাস। ঔপন্যাসিকের বিবরণ যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন, তার দরদী চোখে ধরা পড়েছে সার্বিক সহযোগিতাপূর্ণ দাম্পত্য ও সামাজিক জীবনের আকাঙ্খা, 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসে স্থানে দ্বন্দ্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের তফাৎ এই উপন্যাসে উঠে এসেছে, রাধিকাসুন্দরী, পরি, প্রভৃতি প্রান্তিকায়িত মানুষ নিজেদের জীবন ও উপলব্ধি দেিয় সমস্যাগুলিকে বুঝতে চেয়েছে।

সুমতিবালা চরিত্রটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলে তিনি আসলে পুরানো সময়ের ছাঁচে চালা, তারপর আবার প্রান্তিকায়িত, শিক্ষার আলো তাদের কোনো অংশেই পৌঁছতে পারেনি। সুমতিবালা নিজস্ব Identity তৈরি করার পরিবর্তে 'Safety Sceurity' নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করে পুরুষের বিরোধিতা করার সাহস সুমতিবালার ছিল না। তাই শহর থেকে ফেরা মেয়েকে বেশিদিন বাড়িতে রাখতে চায়নি সুমতিবালা। তিনি আসলে নারীকে বোধহয় নির্দিষ্ট একটি ছকে দেখতে চেয়েছিলেন। পুরুষ শাসিত সমাজ তার যুক্তি বুদ্ধি-র দ্বারা রাধার নিজস্ব বিচারের পথকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। নির্ঝঞ্ঝাট, নির্বিবাদী নারী চিরকাল-ই তা মেনে এসেছে। যখন ই প্রতিবাদ করতে গেছে তখনই তাকে অজস্র প্রতিবাদ, প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয়েছে, অভাবটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষা, শুধু শিক্ষা বলা ভুল, স্বনির্ভর এবং আত্মসচেতনার অভাব। যেদিন থেকে নারী সমাজ পরিসরের এই সকল ত্রুটিকে অতিক্রম করতে পারবে সেদিন-ই হবে আসল নারীর চেতনা, তবে উপন্যাসের মূল বিষয় নারীকে চেতনায়িত করা। কিন্তু বয়ানের শেষে কোথাও আনন্দকর পরিসমাপ্তি নেই। আছে Tragic Ending তবে এই বয়ানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় নারীবাদী আখ্যান। আখ্যানের ভিন্ন ধারার ক্ষেত্রে নারীবাদী আখ্যান একটি অন্যতম, আখ্যান কি ও কেন তা নিয়ে ভিন্ন মতামত থাকলেও 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসের বয়ানে আখ্যান এক অভিনব মাত্রায় ধরা দিয়েছে, আখ্যানে যেমন উপন্যাসের মতো জটিলতার ঘনীভবন থাকে না। চরিত্রের গতীর দ্বন্দ্ব থাকে না কিন্তু একটা অসাধারণ কথন যাকে থাকে আমরা আখ্যান বলতে পারি। তবে, 'রাধিকাসুন্দরী'-র বয়ানে উপন্যাস ভাবনাটা অনেকটাই বেশি বললে ভুল হবে না।

প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ্য –

> "সময় ও পরিসরের বহুমাত্রিক টানাপোড়েনে তৈরি হয় কাহিনি। আবার একই কারণে ভেঙে যায় তার অবয়ব। মানুষ নিজের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, সাধও সাধ্যের ব্যবধান নিয়ে উদ্বেল হয় কখনও কখনও বা বিষণ্ন। আবার তার সত্তার পর্যটন পেরিয়ে যায় পরিচিত দ্বৈততা। কথকতার নতুন বিন্যাস দিয়ে কাহিনির ভেতর ও বাইরের অভ্যাসকে পাল্টে দেয় মানুষ। বিশ শতকের অন্তিম পর্যায়ে লেখার যত রূপান্তর ঘটেছে, সেই জন্যে দায়ী অনিকেত মানুষের পথ হারানো আর পথ খোঁজার দ্বিরালাপ নিবিড় পাঠ আর পুনঃপাঠ ছাড়া এখনকার বিচিত্র প্রতিবেদনগুলির মোকাবিলা করা অসম্ভব। অন্তত সেইসব পাঠকৃতির যাদের উৎস ভূমি অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনা। কাহিনির দিন শেষ কিনা আদি মধ্য অন্ত অবান্তর কিনা, এসব নিয়ে তর্ক করার চেয়ে সাম্প্রতিক বয়ানের গভীরে প্রবেশ করা অনেক ভালো। দেখা যাবে নিশ্চয়তা নেই কোথাও, নেই কোনো চূড়ান্ত বিন্দুও। উপন্যাস অভিধার চেয়ে আখ্যান অভিধা হিসেবে বেশি গ্রাহ্য কিনা, এই ভাবনায় মীমাংসা থাকুক বা না থাকুক— নিরবচ্ছিন্ন পাঠের মধ্যে দিয়ে সময়ও পরিসরের আন্তঃসম্পর্ক আর বিন্যাসক্রম যাচাই করে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই কোনো।"[৮]

তথ্যসূত্র :

১. দাস, বেলা, ও বিশ্বতোষ চৌধুরী 'বাংলা আখ্যান বহুমাত্রিক পাঠ, রত্নাবলী, ২০১১, পৃ. ২৫
২. ঐ, পৃ. ৪
৩. চক্রবর্তী, অমলেন্দু, 'রাধিকাসুন্দরী', (১) দে'জ পাবলিশিং ১৯৮৬, পৃ. ৪৫
৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'আখ্যানের সাতকাহণ, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর, ২০০৫
৫. চক্রবর্তী, অমলেন্দু, 'রাধিকাসুন্দরী' (১) দে'জ পাবলিশিং ১৯৮৬, পৃ. ২৮৬
৬. ঐ, (২), পৃ. ১০
৭. ঐ, (২), পৃ. ৩৯৪
৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'আখ্যানের সাতকাহণ', অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর, ২০০৫